ফুলবাড়ীর ঠিকানা

মওদুদ রহমান

অধিকারহীন স্বাধীনতার পতাকার আড়ালে জীবন-জীবিকা আর সম্পদ কেড়ে নেয়ার বিরুদ্ধে মর্যাদা আর মালিকানার প্রশ্নে সরব হয়ে থাকা জনপদের নাম ফুলবাড়ী। ২০০৬ সালে দানবীয় এক প্রকল্পের নামে দেশের সবচেয়ে উর্বর মাটিকে কয়লার শ্মশানে পরিণত করার সরকারি নীতি থমকে দাঁড়ায় এই ফুলবাড়ীর অলঙ্ঘনীয় সীমানা প্রাচীরের সামনে। ২৬ আগস্ট ওই জনপদের মানুষ ফুঁ দেয় রণশিঙ্গায়, জানান দেয়–উন্নয়নের আফিমে তারা ঘুমিয়ে নেই, বুঝিয়ে দেয়–জীবন, জীবিকা আর মর্যাদার প্রশ্নে কোনো আপোস নেই। এগারো বছর পরে এই জনপদের মানুষেরা কী ভাবছেন? তাঁদের কথা নিয়েই এই লেখা।

উন্মুক্ত কয়লা খনি বিরোধী আন্দোলন ফুলবাড়ীর মানুষের অনন্য কীর্তি। ফুলবাড়ী রেলস্টেশনের চা বিক্রেতা করিম আলী, দোকান কর্মচারী রাশেদ, ফেরিওয়ালা হান্নান, ভ্যানচালক হুমায়ূন–কেউই ২৬ আগস্ট ভোলেননি। ২৬ আগস্টের ঘটনা জানতে চাইলে সে সময়ের কিশোর, তরুণ, বৃদ্ধ, নারী-পুরুষ–সবাই স্মৃতির সাগরে কথার ভেলা ভাসিয়ে বর্ণনা করতে থাকেন ওই সময়ের আদ্যোপান্ত। আলাপের বৈঠকে আন্দোলনের আয়নায় স্বতন্ত্র চরিত্রে আবির্ভূত হন বাবলু রায়, বকুল, সন্ধ্যা রানী, গোলবানু। তাঁদের সান্নিধ্যে সাহসের তৃষ্ণা মেটে, জীবনবোধ বিকশিত হয়।

মালিপাড়া বাজারে চায়ের দোকানে পরিচয় হয় সুশীল চন্দ্র পালের সঙ্গে। তিনি পেশায় দিনে কৃষক আর রাতে মুদি দোকানদার। অবশ্য এলাকায় তাঁর বিশেষ পরিচয় শৌখিন গায়ক হিসেবে। আন্দোলন কী কারণে হলো জানতে চাইলে তিনি বলেন, 'ঘরবাড়ি, জমি সব নিয়া যাইতে চাইলে বাধা না দিয়া উপায় আছে!' কিন্তু ক্ষতিপূরণ তো পেতেন–এ কথা শুনতেই তিনি পাল্টা প্রশ্ন করেন, 'সবকিছুর কি ক্ষতিপূরণ হয়?' তিনি বলতে থাকেন, 'এই মাটিতে আমরা দুইটা ফসলের আবাদ করি, শীতে রবিশস্য করি, বাড়িতে হাঁস আছে, মুরগি আছে, আঙিনায় গাছ লাগাইছি, এইখানে আমার ভাই আছে, বোন আছে, পাড়া-প্রতিবেশী আছে, সবকিছুই তো এইখানে আমার। এইগুলার কত টাকা ক্ষতিপূরণ দিবে সরকার?' কিন্তু উন্নয়নের জন্য কয়লা তোলা লাগবেই–এই প্রচারণার বিষয়ে জানতে চাইলে সুশীল বলেন, 'কিসের উন্নয়নের কথা কচ্ছেন? এইখান থিক্যা চার-পাঁচ কিলো দূরে বড়পুকুরিয়া কয়লা খনি ঘুরে আইসেন। ওখানকার মানুষ বাড়িঘর ছেড়ে সব পালাচ্ছে। ওরা এখন খাবার পানিও পায় না। কিনে খাইতে হয়। পানি খেতেই মাসে জনপ্রতি ১৫ টাকা দেয়া লাগে সাপ্লাই পাম্প মালিকরে। আগে ২৫-৩০ ফুট নিচে গেলে পরিষ্কার পানি পাওয়া যাইত। এখন যাওয়া লাগে দেড়-দুইশ ফুট নিচে। আগে আমাদের এখানে পানির কোনো সমস্যা আছিল না। অথচ আমরা এখন পানি পাই না। জমিতে আবাদ খরচ বাইড়া গেছে। মহাজন এক একরে পানি সাপ্লাই দিতে সাড়ে ৩ থেকে ৪ হাজার টাকা করে নিচ্ছে। বড়পুকুরিয়া এলাকায় এখন মাটি দেবে পানি উইঠে গেছে। বাড়িঘরের দেয়ালে ফাটল ধরছে। আগে যে রাস্তায় গাড়ি চলত এখন সেখানে নৌকা চলছে।' আন্দোলনের মাধ্যমে এশিয়া এনার্জিকে ঠেকানো না গেলে ফুলবাড়ীতেও বড়পুকুরিয়ার মতো অবস্থা হতো কি না জানতে চাইলে তিনি বলেন, 'অবস্থা আরও খারাপ হতো। ওইখানে তো মাটির নিচ খুঁড়ে কয়লা উঠাচ্ছে, আর এখানে মাটি তুলে ওপেন পিট মাইন করার কথা ছিল।' সুশীলের জীবন থেকে পাওয়া শিক্ষার তত্ত্বসারের সাথে মনে মনে বিজ্ঞাপনী প্রচারে কোম্পানির এজেন্ট হয়ে বক্তৃতা দেয়া ডিগ্রিধারী বিশেষজ্ঞ আর রাজনীতিবিদদের কয়লা বিদ্যুৎ আর খনি নিয়ে দেয়া অসার যুক্তিগুলো মিলিয়ে নিচ্ছিলাম। উন্নয়নের উল্টো রথের সওয়ারি হতে অস্বীকৃতি জানানো সুশীল চন্দ্র পালদের দেয়া যুক্তিগুলোর ত্রিসীমানায় তথাকথিত বিশেষজ্ঞরা কেন আসেন না তা বেশ বুঝতে পারছিলাম।

'কিসের উন্নয়নের কথা কচ্ছেন? এইখান থিক্যা চার-পাঁচ কিলো দূরে বড়পুকুরিয়া কয়লা খনি ঘুরে আইসেন। ওখানকার মানুষ বাড়িঘর ছেড়ে সব পালাচ্ছে। ওরা এখন খাবার পানিও পায় না। কিনে খাইতে হয়। পানি খেতেই মাসে জনপ্রতি ১৫ টাকা দেয়া লাগে সাপ্লাই পাম্প মালিকরে। আগে ২৫-৩০ ফুট নিচে গেলে পরিষ্কার পানি পাওয়া যাইত। এখন যাওয়া লাগে দেড়-দুইশ ফুট নিচে। আগে আমাদের এখানে পানির কোনো সমস্যা আছিল না। অথচ আমরা এখন পানি পাই না। জমিতে আবাদ খরচ বাইড়া গেছে। মহাজন এক একরে পানি সাপ্লাই দিতে সাড়ে ৩ থেকে ৪ হাজার টাকা করে নিচ্ছে।'

২৬ আগস্ট ফুলবাড়ী আন্দোলনে আহত বাবলু রায় এখন পঙ্গু। নিম্নাংশ অবশ হয়ে যাওয়া শরীরে বাসা বেঁধেছে নানা রোগ। ঘরের আঙিনায় বিছানো চৌকিই এখন তাঁর বিচরণের একমাত্র জমিন। একসময় ভ্যান চালিয়ে শহরের এমাথা থেকে ওমাথায় চষে বেড়ানো বাবলু রায়কে এখন হাসপাতালে যেতে হয় ভ্যানে শুয়ে থাকা অসুস্থ যাত্রী হিসেবে। অসময়ে পেকে যাওয়া চুল তাঁর চেহারার দীপ্তি কেড়ে নিতে পারেনি। শান্ত, ধীর কিন্তু স্পষ্ট উচ্চারণে যখন কথা বলছিলেন তখন আমরা তা শুনছিলাম মুগ্ধ শ্রোতার মতো। তাঁর লম্বাটে গড়নের শ্যামলা চেহারায় যেন প্রচণ্ড ঝড়ের রাতে নিভু নিভু হয়ে জ্বলতে থাকা প্রদীপশিখার আলো ছড়িয়ে ছিল। সেই আলোয় মায়ায় যেন আটকে ছিল সবার দৃষ্টি।

বাবলু রায় ন্যায় প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে অন্যায়ের বিষ নিজ শরীরে ধারণ করেছেন। সেই বিষ ছড়িয়েছে তাঁর দেহে, তাঁর পরিবারে। তাঁর বড় দুই ছেলের লেখাপড়া বেশিদূর এগোয়নি। ছোট ছেলের লেখাপড়া কোনো রকমে চলছে। স্ত্রী সন্ধ্যা রানী ধৈর্য আর মমতা দিয়ে ঘুরিয়ে চলেছেন সংসারের চাকা। কিন্তু তাঁর বুকে হিমালয় সমান কষ্টের বোঝা। স্বামীর শারীরিক যন্ত্রণা আর সংসারের আর্থিক দৈন্যদশা তিনি বলতে পারলেন খুব সামান্যই, বাকিটুকু ঢাকা পড়ে গেল করুণ বিলাপের সুরে। বাবলু রায়ের বাসা থেকে বেরোতে বেরোতে সন্ধ্যা নেমে এসেছিল। কিছুতেই থামানো গেল না সন্ধ্যা রানীর কান্না। কান্না

সামলানোর ছল করতে একবার মনে হয়েছিল বলি যে, 'বউদি, কান্না থামান। ঘরে সন্ধ্যাবাতি জ্বালবেন না?' কিন্তু পরক্ষণেই মনে হলো, বাবলু রায়ই সন্ধ্যা রানীর সন্ধ্যাবাতি। যে ঘরের আঙিনায় বাবলু রায় শুয়ে আছেন, সেই ঘরে কোনো অনিষ্ট প্রবেশ করতে পারবে না। যে অঞ্চলে বাবলু রায়রা আছেন সেই অঞ্চলকে কোনো কোম্পানির কাছে বেচে দেয়া যাবে না।

গোলবানু সাতচল্লিশের দেশভাগের সময় ভিটেমাটি ছেড়ে নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে এসেছিলেন এই ভূখণ্ডে। এখানেই বেড়ে উঠেছেন, সংসার পেতেছেন, পরিবার-পরিজন, প্রতিবেশী মিলে নতুন ঠিকানা গড়ে তুলেছেন, ভিটে হারানোর যন্ত্রণা তিনি জীবন দিয়ে উপলব্ধি করেছেন। তাই ২৬ আগস্টের সেই গণবিদ্রোহের সময় তিনি ঘরে বসে থাকতে পারেননি। শহরে কারফিউ জারি করে, গ্রেপ্তার, নির্যাতন, গুম আতঙ্ক ছড়িয়ে পুরো ফুলবাড়ী পুরুষশূন্য করে ফেলার নীলনকশায় সরকারি বাহিনীর কাছে মূর্তিমান আতঙ্ক হয়ে রাস্তায় নেমে আসেন গোলবানু। হাতে ছিল বঁটি আর ঝাড়ু। জীবনের মায়া তুচ্ছ করে তাক করে রাখা বন্দুকের জাল সরিয়ে তিনি হাঁটতে শুরু করেন মূল সড়কের দিকে। মুহূর্তেই ছড়িয়ে পড়ে সাহসের দাবানল। আশপাশের সব বাড়ি থেকে দা, বঁটি, ঝাড়ু, স্যান্ডেল হাতে বেরিয়ে আসে বাড়িতে থাকা নারীর দল। ওই দিনের বর্ণনায় গোলবানু বলেন, 'ঘরে দুই দিন ধইরে ছিল না খাবার। রাস্তায় নেমে দেখি সব দোকানপাট বন্ধ। জানতি পারলাম শহরে নাকি কারফিউ দিছে। রাগে আর মাথাটা ঠিক রাখতে পারলাম না।...আমাগো কামাই খাস আর আমাগো মারস? দেখি আজ কী হয়! বাসায় আইসা ঝাড়ু আর বঁটি নিয়ে বের হলাম। বিডিআরের দিকে হাঁটা শুরু করলাম। ওগোরে ধাওয়া দিলাম ব্রিজের দিকে। বিডিআর আর পুলিশ হাসতে হাসতে সরে গেছে। ভাবছে আমি পাগল। কিন্তু আমি যাই নাই। পরে সব মহিলারা নামছে রাস্তায়। আমরা কইছি কোনো কারফিউ মানি না। ১৪৪ ধারা ভাঙলাম। আয় দেখি কে আছস। এরপর তো আমরা সব রাস্তায়। মিছিল করছি। বিডিআরের ভয়ে আশপাশের গ্রামে যারা আড়ালে ছিল রাতে তারাও আইলো।' এইখানে আবার যদি কয়লা খনি করতে আসে–কথাটা শুনতেই গোলবানু বললেন, 'আমরা বাঁচি থাকতে এই চুক্তি পারবি না করতে। কী মনে করছে, আমরা মরি যাবো? আমরা যদি একটা মানুষ মরি যাই আমাদের ছাওয়াল-পাওয়াল তিনটা বড় হবে। মায়ের ইতিহাস ধরে কি থাকবে না?' চৌকি আর আলনাসর্বস্ব গোলবানুর ঘরটাকে মনে হচ্ছিল ফুলবাড়ী সাহসের আঁতুড়ঘর। গোলবানুদের ছড়িয়ে দেয়া সাহসের জমিনে এমনি করেই বুঝি বাড়ছে আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্ন মানুষের সংখ্যা।

ফুলবাড়ীর করিম আলী আর সুশীল চন্দ্ররা ধর্মের শিবিরে ভাগ হননি, বরং মালিকানার প্রশ্নে এক হয়েছেন। মসজিদের মিনার আর মন্দিরের ত্রিশূল তাঁদের হিন্দু-মুসলমানে আলাদা করতে পারেনি, বরং অধিকার আদায়ের মিছিলে তাঁরা মানুষ হিসেবে এক হয়েছেন। ২৬ আগস্টে জুলুমের চূড়া পদানত করা ওই সময়ে দানবের চক্রব্যূহ ভেদ করার প্রথম ডাক আসে মসজিদের মাইকগুলো থেকে। ফুলবাড়ী দিবসে এলাকার মসজিদে শহীদদের আত্মার মাগফিরাতে দোয়া মাহফিল আর মন্দিরের কীর্তনের আয়োজন দিয়ে ধর্মে ভাগ করে রাখা নীতিপাশার দান ওই অঞ্চলের মানুষ উল্টে দিয়েছে। ধর্ম, বর্ণ, জাত তাঁদের ভাগ করতে পারেনি। কৃষক, মজুর, আদিবাসী, ছাত্র-শিক্ষক-মুদি দোকানি সেখানে শ্রেণী প্রশ্নে এক হয়ে শোষণের নীতিকে পাল্টা চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছে। ফুলবাড়ীর জমিনে রক্ত ঢেলে তরিকুল, আল আমীন, সালেকীন সেই এক হয়ে যাওয়া রাজনীতির বিজয়স্তম্ভের ভিত গেড়ে দিয়েছে।

ফুলবাড়ী আন্দোলনের রাজধানী। ফুলবাড়ীর গোলবানু আর সন্ধ্যা রানী নতুন দিনের সূর্য জাগানো সোনার কাঠি। এই গোলবানুর তেজের আগুনে পুড়ে খাক হয়ে যাক রাষ্ট্রের অহমিকা। এই সন্ধ্যা রানীর মমতার আঁচল হোক আমাদের সাহসের পতাকা, ৫৬ হাজার বর্গমাইলের বাংলাদেশে ছড়াতে থাকুক ফুলবাড়ী মুক্তাঞ্চলের সীমানা।

মওদুদ রহমান: লেখক, প্রকৌশলী।
ইমেইল: mowdudur@gmail.com

ছবি : ২০০৬ সালে ফুলবাড়ী গণ-অভ্যুত্থানে অংশ নেয়া গোলবানু; আলোকচিত্র সংগ্রহ: Phulbari Solidarity Group, UK